বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থার নেপথ্য কাহিনী – (১)

আমাদের এ মুসলিম ভূখণ্ডে কাফেরদের ষড়যন্ত্র নতুন নয়। পূর্বে ক্রুসেডার ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক দস্যু থেকে যার সূচনা হয়েছে। সেটিকে গনতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী মুরতাদ শাসকরা পূর্ণতা দানে অব্যাহত শ্রম দিয়ে যাচ্ছে। ক্রুসেডার ও হিন্দুত্ববাদীদের বিষাক্ত থাবায় উপমহাদেশের মুসলিমদের ইসলামি ঐতিহ্য ও শিক্ষাব্যবস্থা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক্ষতির দিক হলো, ইসলামি মূল্যবোধের শিক্ষা ও সংস্কৃতি ধ্বংস , মুসলিমদের একটি অথর্ব জাতিতে পরিণত করার চেষ্টা , ইসলামের মৌলিক আকিদাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে শিরক, কুফর ও নাস্তিকতার দিকে ধাবিত করা।

কেননা ইসলামের আদর্শ থেকে দূরে সরাতে পারলেই মুসলিমরা আর কখনোই সগৌরবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। পরিণত হবে একটি নির্জীব-নিস্তেজ গৃহপালিত পশু সমাজে। ফলাফল হিসেবে মুসলিমরা আর কখনোই দখলদারিত্বের বিরুদ্ধাচারণ করবে না। বরং তাদের তোষামোদি, দালালি ও চামচামিতেই ব্যস্ত থাকবে। এ কালে এমনটাই ঘটছে। অসংখ্য মুসলিম ঘরের সন্তান আজ গণতান্ত্র, সমাজতান্ত্র ও সেকুল্যারিজমে বিশ্বাস করে। অতএব, এ শ্রেণীটি ক্রুসেডার-হিন্দুত্ববাদীদের বিরুদ্ধাচরণ করবে চিন্তা করা কল্পনাতীত , বরং তারাতো নিজেরাই ক্রুসেডার হিসেবে কাজ করছে। কাফেরদের বিরুদ্ধাচরণ মানে নিজ গদির বিরুদ্ধে অবস্থান।

অনেকেই মনে করেন, ক্রুসেডার ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকার উপমহাদেশে তাদের শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো কম বেতনে ইংরেজি-শিক্ষিত কেরানির দল তৈরি করা। কিন্তু অল্পকিছুদিন পরই তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য উন্মোচিত হয়। ১৭৯৩ সালে খ্রিস্টান মিশনারিরা এসে যোগ দেয় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের শিক্ষা ছড়িয়ে দিতে। শুরুতে ব্রিটিশরা দখলদারিত্ব টিকিয়ে রাখতে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে মিশনারিরা সেটিকে পূর্ণতা দান করে। আর হিন্দুত্ববাদীরা ছিলো মিশনারিদের একনিষ্ঠ সহায়তাকারী। মিশনারিরা প্রারম্ভে ইংরেজি শিক্ষাকে উপমহাদেশের স্থানীয়দের খ্রিস্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত করার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে। পরবর্তীতে ব্রিটিশ দখলদাররা ইংরেজি শিক্ষিতদের চাকরি ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা দেয়। এতে ইংরেজি শিক্ষা ব্যক্তি পর্যায়ে গুরুত্ব পেতে থাকে । ফলে মিশনারিরা প্রথম পর্যায়ে সফল হয়।

কিন্তু তাদের সফলতায় বরাবরের ন্যায় বাধা হয়ে দাঁড়ায় মুসলিমরা। খ্রিস্টান ধর্ম ও উপমহাদেশের ধর্মসমূহের মধ্যকার সাংস্কৃতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকরা মুসলিমদের প্রভাবিত করতে ব্যর্থ হয়। সত্য দ্বীন ইসলামের অনুসারী মুসলিমরা খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেনি। শ্রীরামপুরের ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি প্রেস থেকে ১৮০৯ সালে প্রচারিত একটি মিশনারি প্রচার পত্রে প্রিয়নবী মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে কতিপয় নেতিবাচক মন্তব্য করা হলে তা মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি করে। মুসলিমদের প্রতিবাদের ফলে ব্রিটিশরা এ প্রকাশনাটিকে একটি অবিবেচনাপ্রসূত কাজ বলে রায় দেয়। এরপর মিশনারিরা আর কখনও এরকম কিছু প্রকাশ করেনি যা মুসলিমদের মনে সরাসরি আঘাত হানতে পারে। তখন থেকেই মুসলিমদের মাঝে ধর্ম প্রচারের ব্যাপারে মিশনারী যাজকরা অধিক সতর্কতা অবলম্বন করে। ঐ সময় সাধারণভাবে মুসলিম সমাজ খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকদের প্রচেষ্টার আওতার বাইরে থেকে যায়। তবে, মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামীণ পূর্ব বঙ্গে বেশকিছু খ্রিস্ট ধর্মপ্রচার কেন্দ্র গড়ে তুলেছিলো,কিন্তু সেটিতেও তারা সফলতা অর্জন করতে পারেনি।

অন্যদিকে মুসলিমরা ছিলো ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক দখলদারিত্বের জন্য মারাত্মক হুমকি। দ্য রিফরমার লিখেছে, ‘গ্রেট ব্রিটেনের মুসলিম ও হিন্দু প্রজাদের কর্মের পেছনে যে প্রবণতা কাজ করে তার পার্থক্য থেকে আমরা আবিষ্কার করতে পারি প্রথমোক্তদের রাজানুগত্যহীনতা ও শেষোক্তদের বিশ্বস্ততা। .....সরকারেরও উচিত এ থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যে মুসলিম প্রজাদের ওপরেই তাদের সতর্ক লক্ষ রাখতে হবে, কেননা মুসলিমরাই বিচ্ছিন্নতা ও বিদ্রোহের প্রতি অতিমাত্রায় আসক্ত।’

এতসব কারণে তারা মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর নানা গবেষণা চালায়। গবেষণা লব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে ক্রুসেডার মিশনারিরা দ্বিতীয় পর্যায়ে নতুন শিক্ষা-কার্যক্রম হাতে নেয়। তারা উপমহাদেশে বেশ কয়েকটি ধাপে শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করে। প্রথমোক্ত সময়কালে অর্থাৎ **১৭৯৩-১৮৩১** সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংকের আমলে ইংরেজি শিক্ষা 'ইন্ডিয়ান এডুকেশন অ্যাক্ট' (Indian Education Act) সম্প্রসারণে যতটুকু হয়েছে, তা হয়েছে ক্রুসেডার-মিশনারিদের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার দ্বারাই।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ক্রুসেডাররা চার্লস উডের সময় সম্পূর্ণ নতুন শিক্ষা-কার্যক্রম চালু করে। যা 'উড'স ডেসপ্যাচ অন এডুকেশন' (Wood's Despatch on Education) নামে পরিচিত। সত্যিকার অর্থে এ শিক্ষা-কার্যক্রমে অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় যার মাধ্যমে স্থানীয়দের বিশেষত মুসলিমদের ক্রমান্বয়ে ধ্বংস করার প্ল্যান করা হয়, যারা একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে নিজ ধর্ম সম্পর্কে কোন কিছুই জানতে পারবে না। ধাপে ধাপে এই শ্রেণীটি বোধশক্তি হারিয়ে একটি অথর্ব জাতিতে পরিণত হবে। অর্থাৎ একজন ব্যাক্তি দেখতে-শুনতে হবে 'ভারতীয়' কিন্তু চিন্তা-চেতনায় হবে 'ব্রিটিশ '।

এই প্রক্রিয়ার বাস্তব নমুনা আজকে আমাদের চোখের সামনেই, যদি সাধারণ শিক্ষার্থীদের প্রতি লক্ষ্য করেন, তো তাদের চুলের ধরণ থেকে শুরু করে পোশাকের বেশ-ভুষা দেখলেই অনুমান করতে পারবেন। তবুও যদি নম্র-ভদ্র একটি মেধাবী শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞেস করেন, বাবা এদিকে এসো, বলতো 'শরিয়্যাহ' কী? দেখবেন, চোখ দুটো কপালে তুলে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে, কোনো সাড়াশব্দ নেই। মিশনারিরা এসব অপদার্থগুলো তৈরি করার জন্যই দীর্ঘ পরিকল্পনা তৈরি করেছিলো।

ব্রিটিশ অর্থায়নে উপমহাদেশে অসংখ্য স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তন্মধ্যে অল্প কয়েকটি উল্লেখ করছি – **১৭৮১** সালে আলিয়া মাদ্রাসা, **১৭৯১** সালে সংস্কৃত কলেজ, **১৮০০** সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, **১৮১৮** সালে শ্রীরামপুর কলেজ, **১৮১৭** সালে হিন্দু কলেজ (বর্তমানে প্রেসিডেন্সি কলেজ), **১৮৫৭** সালে কলকাতা বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়সহ আরো কিছু কলেজ ইত্যাদি স্থাপিত হয়। এসব প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে আলিয়া মাদ্রাসার বর্তমান কার্যক্রম ও অবস্থা থেকে কোনো বোধসম্পন্ন মুসলিমেরই বুঝেতে বাকী থাকার কথা নয় যে এইসব প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য কী ছিলো? অন্যসব প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য বলায় বাহুল্য।

এগুলোর মধ্যে ১৮১৭ সালে রামমোহন রায় ও ডেভিড হেয়ারের প্রচেষ্টায় স্থাপিত হিন্দু কলেজ সম্পর্কে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। শুরুতে এ প্রতিষ্ঠানটিতে কোন মুসলিম ভর্তি হবার সুযোগ ছিল না। সুযোগ ছিল না বলতে মুসলিমরা এ শিক্ষা গ্রহণ করতেই চাইনি। উপমহাদেশে শিক্ষা বিস্তারে ক্রুসেডারদের অসংখ্য পরীক্ষা চালানোর নজির আছে। প্রতিবারই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমে কীভাবে স্থানীয়দের ধর্মতাত্ত্বিক মেধাকে পঙ্গু করা যায় সেই চেষ্টাই করেছিলো। স্থাপিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে মিশনারিরা নিজেদের সুবিধামতো শিক্ষক নিয়োগ করতো। এদের মধ্যে হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও ১৮২৬ সালে কলকাতা হিন্দু কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হয়। সে ছিলো একজন গোড়া সেকুলার। সে ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাস পড়াতো। তার পাঠদানের পদ্ধতি ছিলো তার ধ্যান-ধারণার মতোই। শিক্ষক হিসেবে তার কর্মকাণ্ড শ্রেণিকক্ষে সীমাবদ্ধ ছিলো না। ছাত্রদের সেক্যুলারিজমে আগ্রহী করতে ছাত্রদের সঙ্গে কলেজ প্রাঙ্গণের বাইরেও, প্রায়ই তার নিজের বাসায় আলোচনা করতো। শুধুমাত্র হিন্দু কলেজেই নয়, প্রতিটি কলেজ থেকে অসংখ্য হিন্দু হয় নাস্তিক্যবাদী নতুবা হিন্দুত্ববাদী শিক্ষা লাভ করে। এরই অংশ হিসেবে অসংখ্য হিন্দু লেখক তৈরি হয়। তারা প্রত্যেকেই ছিলো ইসলাম বিদ্বেষী। যারা পরবর্তীতে হিন্দুত্ববাদী-সেকুল্যারিজম প্রচারে অসংখ্য সাহিত্য রচনা করে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। মিশনারিদের প্ল্যান ছিলো, যেহেতু প্রারম্ভেই মুসলিমদের তাঁদের নিজ ধর্মের বিরুদ্ধে নেয়া যায় না। তাই সেক্যুলারিস্ট ও হিন্দুত্ববাদী সাহিত্যিকের লেখা পাঠ্যক্রমই হয় ব্রিটিশ আরোপিত উপমহাদেশের শিক্ষা সিলেবাস।

ব্রিটিশ দখলদারদের এ কাজে সাহায্য করে উপমহাদেশীয় ‘উঁচু’ পর্যায়ের মুশরিক হিন্দুরা। মিশনারিরা উপমহাদেশের হিন্দুদের সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয়-আচারানুষ্ঠান যেমন, জাতিভেদ প্রথা, সতীদাহ প্রথা, শিশুহত্যা, অন্তর্জলি (রুগ্ন ব্যক্তিদের নদীর তীরে অনাবৃত অবস্থায় ফেলে রাখা) ইত্যাদি কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। ১৮২৯ সালে রামমোহন রায়ের উদ্যোগে লর্ড বেন্টিঙ্ক এ রকম কিছু আচারকে নিষিদ্ধ করে আইন পাশ করে। ফলে অসংখ্য হিন্দু মিশনারিদের প্রচেষ্টায় খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করে। তন্মধ্যে মহেশ চন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণ মোহন ব্যানার্জী ও লাল বিহারী দে তাদের মধ্যে অধিক প্রসিদ্ধ যারা খ্রিস্টান হয়। এ ধর্মান্তরকরণ কলকাতার মুশরিক সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে। ব্রিটিশদের এ প্রচেষ্টাকে রামমোহন রায় উষ্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে। ধর্মান্তরের ফলে কিছু কিছু হিন্দু মিশনারিদের বিরোধীতাও করেছিলো। কিন্তু বরাবরের ন্যায় উঁচু পর্যায়ের হিন্দুরা মিশনারিদের তাবেদারিতেই লিপ্ত ছিলো। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা) , মনোমোহন ঘোষ ও কেশবচন্দ্র সেন

এর পরিবার। তারা চাইত তাদের পরিবারে যেন উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে পারে। অন্যরা বিভিন্নভাবে সাহিত্য রচনার করে মিশনারিদের সাহায্য করে। তন্মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র,রামমোহ রায়,ঈশ্বরচন্দ্র প্রমুখ ও মিশনারিরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অসংখ্য হিন্দু লেখক তৈরি করে। আর এই হিন্দুত্ববাদী সাহিত্যকে ব্রিটিশরা পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করে উপমহাদেশের মুসলিম-হিন্দু সবার জন্যই বাধ্যতামূলক করা হয়।

ব্রিটিশ শাসিত সময়ে কোনো লেখকের পক্ষে সাবস্ক্রিপশনের সাহায্য ছাড়া বাংলায় বই প্রকাশ করতে পারত না। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ২৫ বছর যেসব বাংলা বই প্রকাশিত হয়েছে, তার অধিকাংশই সেসব বই, যা ডক্টর উইলিয়াম কেরি প্রকাশের যোগ্য মনে করেছে। এটি থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় বঙ্কিমচন্দ্ররা যেসব সাহিত্য রচনা করেছে তার সবগুলোই মিশনারি কর্তৃক যাচাই-বাছাইয়ের পর স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। অতএব, প্রিয় পাঠক আপনি চোখ বুলিয়ে দেখে আসুন বর্তমান বাংলাদেশের পাঠ্যক্রমের অবস্থা। সেদিনের বঙ্কিমচন্দ্ররা আজ কীভাবে এ-দেশের সিলেবাসে জায়গা করে নিয়েছে। কারা তাদেরকে জায়গা করে দিয়েছে? কেনো দিয়েছে? কল্পনাশ্রয়ী কিছু হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি সাহিত্যের নামে এ দেশের পাঠ্যক্রমে ঢুকিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সন্তানদের কী শিক্ষা দিতে চাই ওরা?

বর্তমান এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ব্রিটিশদের প্রণয়ন করা পদ্ধতির কোনো পরিবর্তন হয়নি। মুরতাদ শাসকরা বিভিন্ন সময় পাঠ্যক্রম পরিবর্তন-পরিমার্জন করেছে। কিন্তু ক্রুসেডারদের আদর্শ থেকে এক চুলও নড়েনি। নিঃসন্দেহে বলা যায় এটি একটি কুফরি শিক্ষা ব্যবস্থা।

আমাদের এই সিরিজে এ শিক্ষা ব্যবস্থার কিছু কিছু গোপন দিক খোলাসা করার চেষ্টা করা হবে ইনশাআল্লাহ্। উন্মোচন করা হবে বর্তমান শিক্ষাক্রমের যে পাঠগুলো একজন মুসলিমকে ঈমান থেকে সরিয়ে কুফর,শিরক ও নাস্তিকতার দিকে নিয়ে যায়।

(চলবে ইনশাআল্লাহ্...)

রেফারেন্স :

[১] MM ali, The Bengali Reaction to Christian Missionary Activities 1833-1857, Chittagong, 1965

[২] ED POHS, British Baptist Missionaries in India 1793-1837: The History of Serampore and its Missions, Cambridge, 1967

[৩] KP sengupta, The Christian Missionaries in Bengal 1793-1833, Calcutta, 1971

[৪] MA laird, Missionaries and Education in Bengal 1873 – 1937, Oxford, 1972

[৫] B stanley, The History of the Baptist Missionary Society 1792-1992, Edinburgh, 1992

[৬] A Copley, Religions in Conflict : Ideology, cultural contact and conversion in late-colonial India, Delhi, 1997.